The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

নাসের খসরুর সফরনামা: ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য

[The Safarnama of Nasir Khusraw: Historical Importance and Significance]

Dr. Md. Ataullah
Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:

Received : 28 May 2025
Received in revised: 02 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Nasir Khusraw; Safarnama; Medieval Travel Literature; Islamic Civilization; Fatimid Caliphate; Ismaili Thought

ABSTRACT

Nasir Khusraw (1004-1088) was a foremost Persian poet, philosopher, traveler and Isma'ili missionary of the Fatimid Caliphate. He left behind a number of significant literary works in Persian literature. Among his literary works, *Safarnama* occupies a position of paramount importance in Persian travel literature and serves as a valuable historical source for the study of the 11th century Islamic world. Written on the basis of the author's seven-year journey (1046-1052 CE) across the Central Asia, Iran, the Arabian Peninsula and Egypt, the work provides detailed observations of geography, administration, economy, religious life and social customs. The study highlights Nasir Khusraw's role not merely as a traveler but as a keen observer and intellectual, whose descriptions of cities such as Mecca, Jerusalem and Cairo offer first-hand evidence of Fatimid governance, urban organization and religious institutions. While acknowledging the author's Ismaili ideological stance, the article argues that *Safarnama* maintains a high degree of factual accuracy, making it an indispensable source for historians. Ultimately, this evaluation demonstrates that *Safarnama* is not only a literary masterpiece but also a crucial historical document that enriches our knowledge of medieval Islamic civilization. This article attempts to describe the *Safarnama* of Nasir Khusraw, focusing on its historical importance and significance.

ভূমিকা

ইতিহাস চর্চায় সাহিত্য বিষয়ক রচনার গুরুত্ব দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত। বিশেষত *সফরনামা* বা ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যযুগীয় ইতিহাস পুনর্গঠনে এক অনন্য উৎস হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্রীয় দলিল, রাজকীয় ফরমান বা দরবারকেন্দ্রিক ইতিহাস যেখানে শাসকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেয়, সেখানে *সফরনামা* একজন সচেতন পর্যবেক্ষকের চোখে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বহুমাত্রিক চিত্র তুলে ধরে। এ কারণে *সফরনামা* শুধু সাহিত্যকর্ম নয়; বরং ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উৎস। সাহিত্যের ধারায় নাসের খসরুর *সফরনামা* শিরোনামে প্রকাশিত প্রন্থটি একটি ব্যতিক্রমী ও মূল্যবান গ্রন্থ, যা একাদশ শতকের ইসলামি বিশ্বের ইতিহাস বিষয়ে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। নাসের খসরু (১০০৪-১০৮৮ খ্রি.) ছিলেন একজন দার্শনিক, কবি, ধর্মতাত্ত্বিক ও পর্যটক। তাঁর *সফরনামা* মূলত ১০৪৬ থেকে ১০৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছরের ভ্রমণকালের বিবরণ, যেখানে তিনি খোরাসান, ইরান, আর্মেনিয়া, আনাতোলিয়া, আরব উপদ্বীপ এবং বিশেষভাবে মিশরের ফাতেমীয় খেলাফতের বিস্তৃত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থের গুরুত্ব এই কারণে যে, এটি একদিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত, অন্যদিকে লেখক নিজে ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, যুক্তিবাদী এবং সমাজ-সচেতন পর্যবেক্ষক। ফলে তাঁর বিবরণ আবেগনির্ভর নয়; বরং তুলনামূলকভাবে তথ্যনির্ভর ও বিশ্লেষণাত্মক। *সফরনামা* সাহিত্যের ঐতিহ্য ইসলামি সভ্যতায় সুপ্রাচীন। আল-মুকাদ্দাসি[১], ইবনে হাওকাল[২] কিংবা পরবর্তীকালে ইবনে বতুতার[৩] মতো পর্যটকরা ভৌগোলিক ও সামাজিক তথ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তবে নাসের খসরুর *সফরনামা* তাদের থেকে পৃথক, কারণ এটি কেবল ভ্রমণকাহিনি নয়; বরং রাজনৈতিক প্রশাসন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং নগর সভ্যতার একটি সুসংগঠিত দলিল। ঐতিহাসিক হিসেবে নাসের খসরু সরাসরি নিজেকে উপস্থাপন না করলেও তাঁর পর্যবেক্ষণের গভীরতা ইতিহাসবিদদের জন্য অমূল্য তথ্যভাণ্ডার হিসেবে পথনির্দেশ করে। ঐতিহাসিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি *সফরনামার* গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে লেখকের নিরপেক্ষতা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং তথ্য উপস্থাপনের

সত্যতার উপর ভিত্তি করে। নাসের খসরু ইসমাইলি মতাদর্শে দীক্ষিত ছিলেন এবং ফাতেমীয় খেলাফতের প্রতি তাঁর স্পষ্ট আনুগত্য লক্ষ করা যায়। তবুও তাঁর বর্ণনায় অতিরঞ্জন বা অলৌকিকতার আশ্রয় তুলনামূলকভাবে কম। তিনি নগরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, বাজারের সংখ্যা, কর-ব্যবস্থা, মুদ্রার মান, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাঠামো পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের পরিসংখ্যানধর্মী তথ্য মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *সফরনামা* গ্রন্থের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নগর ইতিহাস। কায়রো, মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম ও ইসফাহানের মতো নগরগুলোর যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা থেকে সমকালীন নগর পরিকল্পনা, স্থাপত্যশৈলী এবং নাগরিক জীবনের একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বিশেষ করে ফাতেমীয় কায়রোর প্রশাসনিক দক্ষতা, শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিক শৃঙ্খলা সম্পর্কে তাঁর বিবরণ আধুনিক ইতিহাসবিদদের জন্য অন্যতম নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত। এই *সফরনামা* মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণেও সহায়ক। বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্যের মূল্য, বাণিজ্যপথ, মুদ্রাব্যবস্থা এবং বাজার ব্যবস্থার বিবরণ প্রদান করে নাসের খসরু একাদশ শতকের ইসলামি বিশ্বের অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। কর-ব্যবস্থা ও রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির কাঠামো বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধে নাসের খসরুর *সফরনামা*র ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

গ্রন্থকার পরিচিতি

নাসের খসরুর *সফরনামা* যথাযথভাবে অনুধাবনের জন্য তাঁর জীবন ও সময়কাল সম্পর্কে সম্যক ধারণা অপরিহার্য। কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সামাজিক অবস্থান ও সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। একাদশ শতাব্দীর ইসলামি বিশ্ব ছিল রাজনৈতিক বিভাজন, মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। এই অস্থির সময়ের একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন নাসের খসরু, যাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক রূপান্তর তাঁর *সফরনামা*র বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। নিম্নে নাসের খসরুর সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

গযনবি শাসনামলের একজন উজ্জ্বল প্রতিভা নাসের খসরুর পূর্ণ নাম হাকিম আবু মুঈন নাসের বিন খসরু বিন হারেস আল-কুবাদিয়ানি বাল্‌খি আল মারওয়াযি।[৪] তিনি ছিলেন একাধারে একজন কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, পর্যটক ও ধর্মপ্রচারক।[৫] তাঁর প্রকৃত নাম নাসের এবং পিতার নাম খসরু। তবে তিনি নিজেকে নাসের খসরু নামে আখ্যায়িত করতেন।[৬] তাঁর উপনাম আবু মুঈন এবং উপাধি হুজ্জাত।[৭] হুজ্জাত শব্দের অর্থ দলিল, বা কারণ।[৮] তিনি নিজের কবিতায় নিজেকে খোরাসান অঞ্চলের হুজ্জাত বলে উল্লেখ করেছেন। ফাতেমীয় খলিফাদের পক্ষ থেকে নাসের খসরুকে এই উপাধি দেয়া হয়েছিল। ইসমাইলি মাযহাবের মধ্যে এটি ছিল একটি সম্মানজনক ধর্মীয় খেতাব বা পদ। কাব্যজগতে তিনি নাসের খসরু আলভি নামে পরিচিত।[৯] কেউ কেউ বলেন-হযরত আলী রা.-এর বংশধর হিসেবে তিনি নামের শেষে আলভি/উলভি উপাধি যোগ করেছেন।[১০] অবশ্য এর যৌক্তিকতা নেই বলে ইরানি লেখকগণ তা প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তিনি যে একজন উচ্চবংশীয় ব্যক্তি ছিলেন, সে বিষয়ে কারো মতবিরোধ নেই। নাসের খসরু ১০০৪ খ্রিস্টাব্দে বালখ নগরীর অন্তর্গত কুবাদিয়ান নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[১১] যা অধুনা তাজিকিস্তানে অবস্থিত।[১২] শৈশব থেকেই তিনি সাহিত্যপ্রেমী এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর শৈশব কেটেছে প্রচলিত নানা বিদ্যা শিক্ষায়। প্রখর মেধা নিয়ে তিনি পড়েছেন দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ-বিদ্যা, চিকিৎসা-শাস্ত্র, খনিজ-বিদ্যা, ইউক্লিডিও জ্যামিতি, সঙ্গীত, ধর্মীয় বিদ্যা, চিত্রাঙ্কন, বক্তৃতা ও সাহিত্যসহ আরও নানা বিষয়। এসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন ছাড়াও নাসের খসরু মিশরে পাটিগণিত, বীজগনিত ও জ্যামিতি শেখাতেন। ফারসির পাশাপাশি আরবি ভাষায়ও তাঁর পুরোপুরি দখল ছিল।

যৌবনেই সৃষ্টি-রহস্যসহ ধর্মীয় নানা বিষয়ের জবাব খোঁজার চেষ্টা করতেন নাসের খসরু। তাই নানা ধর্ম ও মাযহাব নিয়ে ব্যাপক গবেষণা রয়েছে তাঁর। ছোটবেলায় তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন।[১৩] কুরআন, হাদিস, ইলমে ফিকহ, গণিত, চিকিৎসা, সঙ্গীত, জ্যোতির্বিদ্যা, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।[১৪] তিনি যৌক্তিক এবং প্রমাণ ভিত্তিক জ্ঞান বিশেষত কুরআন ও হাদিস, গ্রীক বিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ইউক্লিডের জ্যামিতি বিষয়ে একজন সূক্ষ্ম চিন্তাশীল এবং বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[১৫] বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ ও মতাদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের অত্যন্ত আগ্রহ থাকায় তিনি মাযহাবে যারতুশত, মাযহাবে মানিয়া, ইহুদী, খ্রিস্টান এবং হিন্দুদের ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।[১৬] খোরাসান ছিল ইসলামি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র, যেখানে ফারসি সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের চর্চা বিকশিত হয়েছিল। নাসের খসরু এই পরিবেশেই আরবি ও ফারসি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং দর্শন, গণিত, ধর্মতত্ত্ব ও প্রশাসনিক বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন এবং তৎকালীন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হন।[১৭]

নাসের খসরুর যৌবনকালের মূল্যবান সময় অতিবাহিত হয় গভীর ভাবাবেগে। পিতার মৃত্যুর পর জীবন সংগ্রামে তিনি ছিলেন এক অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধা। তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পর তাঁর সাহস ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মাত্র ২৭ বছর বয়সে সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুযোগ লাভ করেন এবং তেতাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সরকারের উর্ধ্বতন সচিব হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।[১৮] তাঁর পিতা খসরু ছিলেন একজন সরকারী চাকুরিজীবি। পিতার চাকুরির সুবাদে নাসের খসরু বিভিন্ন

সময় সুলতান এবং আমিরদের দরবারে যাতায়াত করতেন। এবং এক সময় তিনি সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।[১৯] কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাসের খসরু গযনবি ও পরে সালজুকি সরকারের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন।[২০] তিনি কর্মক্ষেত্রেও যশ এবং খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তাঁর সময়ে একাধিক রাষ্ট্রনায়কের পরিবর্তন হলেও তাঁর সচিবের দায়িত্ব এককভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

নাসের খসরুর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে তাঁর আত্মজীবনীমূলক স্বপ্ন-অনুভবের মাধ্যমে, যা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন-'এক রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম, জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলল, তুমি আর কত শরাব পান করবে? যা মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং জ্ঞান বুদ্ধিকে ধ্বংস করে। আমি উত্তরে বললাম, জ্ঞানীরা এই বস্তুটি ব্যতীত এমন কিছু তৈরি করতে পারেন নাই যা দ্বারা দুনিয়ার দুঃখ লাঘব করবে। তিনি উত্তর দিলেন যে, অজ্ঞতা এবং উন্মাদনার মধ্যে শান্তি নেই। একজন জ্ঞানী ব্যক্তির উচিৎ নয় যে কাউকে একথা বলা, মানুষকে উন্মাদনার মাধ্যমে পথ দেখানো যাবে; বরং এমন একটি বিষয় তালাশ করবে যা বুদ্ধি, সচেতনতা এবং বদান্যতা বৃদ্ধি করে। তখন আমি বললাম, এটি কিভাবে পাব? বলল, যে খোঁজে সে পায়। অতঃপর আমাকে কিবলার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল।'[২১] এই অভিজ্ঞতা তাঁকে পার্থিব জীবন ত্যাগ করে সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর হৃদয়ে ভ্রমণ এবং আল্লাহর ঘর জিয়ারতের বাসনা জাগে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই ঘটনা শুধু ব্যক্তিগত ধর্মীয় অভিজ্ঞতা নয়; বরং সমকালীন সমাজে বুদ্ধিজীবীদের মানসিক অস্থিরতার প্রতিফলন হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। এই মানসিক রূপান্তরের ফলেই নাসের খসরু ১০৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভ্রমণ ও হজ পালনের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাই আবু সাঈদ এবং একজন ভারতীয় পরিচারককে নিয়ে তিনি তার যাত্রা শুরু করেন, যা প্রায় সাত বছর পর শেষ হয়।[২২] এ সময় তিনি চারবার বায়তুল্লাহ জিয়ারতসহ ইরান ও আরবের বিভিন্ন প্রদেশ, মিশর, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, সিরিয়া, সুদান, আর্মানিস্তান, ইরাক, লেবানন এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন।[২৩] এই সফরের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মিশরের ফাতেমীয় খেলাফত। মিশরে তিনি তিন বৎসর অতিবাহিত করেন।[২৪] ফাতেমীয়রা ছিলেন ইসমাইলি শিয়া মতাদর্শের অনুসারী এবং আব্বাসীয় খিলাফতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বী। কায়রোতে অবস্থানকালে নাসের খসরু ফাতেমীয় প্রশাসন, শিক্ষাব্যবস্থা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতায় গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি আল-আজহারসহ বিভিন্ন জ্ঞানকেন্দ্রে অধ্যয়ন করেন এবং ইসমাইলি দাওয়াহর আনুষ্ঠানিক সদস্য হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি শিয়া মতবাদী ইসমাইলি[২৫] সম্প্রদায়ভুক্ত হন।[২৬] যদিও তিনি ভ্রমণপূর্ব পর্যন্ত একজন সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সাত বছর ভ্রমণ শেষে ১০৫২ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।[২৭] দীর্ঘ দিন তিনি ইসমাইলি মতবাদ প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই মতবাদ প্রচারের দরুন তিনি বিভিন্ন সময় প্রচণ্ডভাবে বাধাগ্রস্থ, অত্যাচারিত, অবহেলিত ও নির্যাতিত হন। এক পর্যায়ে তিনি খোরাসান ছেড়ে বাদাখশানের ইয়ামগান নামক পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[২৮] সেখানেই তিনি ১০৮৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২৯] বর্তমান আফগানিস্তানের কোকশা উপত্যকার পূর্ব দিকে অবস্থিত হযরত-ই সাইয়্যিদ (যাকে হযরত-ই সাইয়্যিদও বলা হয়) গ্রামের একটি ছোট পাহাড়ের উপর তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল।[৩০]

সফরনামার পরিচয়

নাসের খসরুর *সফরনামা* মূলত ভ্রমণকাহিনিমূলক একটি গদ্যগ্রন্থ। এটি বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য শ্রেণির রচনা।[৩১] তাঁর পশ্চিম ইরানে সাত বছরব্যাপী ভ্রমণকালে রচিত সাহিত্যকর্ম হলো *সফরনামা*। এটি একটি প্রামাণ্য ভ্রমণবৃত্তান্ত, যেখানে তিনি তাঁর ভ্রমণপথে সাক্ষাৎ করা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও পরিদর্শিত নগরসমূহের সুসংবদ্ধ ও বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটিতে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণভিত্তিক জ্ঞান প্রতিফলিত হয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি ভ্রমণকালে সংগৃহীত বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বাস্তবতার নির্ভরযোগ্য তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ভাষা, বর্ণনা ও বিষয়বস্তুর গভীরতার কারণে *সফরনামা* ফারসি সাহিত্যের এক অনন্য ও উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে স্বীকৃত।[৩২] *সফরনামা* গ্রন্থে তদানীন্তন মুসলিম জগতের যাবতীয় প্রধান প্রধান স্থানের সূক্ষ্ম ও চমকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে।[৩৩] কাবাগৃহ, জেরুজালেম প্রভৃতি তীর্থস্থানের তৎকালীন অবস্থা ও রীতিনীতি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে তাঁর আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের মধ্যে ভ্রমণসাহিত্যের বিশেষত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব উভয় দিক বিদ্যমান। তিনি প্রায় সাত বছরে (১০৪৬-১০৫২ খ্রি.) কয়েক ডজন শহর পরিদর্শন করেছিলেন। স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, বিজ্ঞানী, রাজা-বাদশা, জনসাধারণ, জনসংখ্যা, শহরগুলির বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণের ঘটনাবলী এবং তাঁর আকর্ষণীয় স্মৃতি সম্পর্কে বাস্তবতার নিরিখে নিজের ভাষায় তা এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। এর ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল।[৩৪] এ গ্রন্থের সাথে নিযামুল মুলকের *সিয়াসতনামা*[৩৫] গ্রন্থের ভাষা এবং রচনারীতির মিল রয়েছে। গ্রন্থটি *তারিখে বায়হাকীর*[৩৬] ন্যায় মর্যাদায় সমকক্ষ। এটি নাসের খসরুর গুহায় অবস্থানকালে রচিত হয়েছে। নাসের খসরু ১০৫২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন।[৩৭] এ গ্রন্থটি প্যারিস থেকে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। নাসের খসরুর এই *সফরনামা* গ্রন্থটি বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[৩৮]

সফরনামা রচনার পটভূমি

ফারসি সাহিত্য ভ্রমণ সাহিত্যে সমৃদ্ধ, যেখানে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য বা নগর-পরিদর্শনের বিবরণ নয়; বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। এ ধারার এক অনন্য কীর্তি হলো

ইরানের প্রখ্যাত কবি, গদ্যকার ও পর্যটক নাসের খসরুর *সফরনামা*। নাসের খসরু ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত আমলা ও ইসমাইলি দাঈ। ১০৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ধর্মীয় ও বৌদ্ধিক অনুসন্ধানে দীর্ঘ ভ্রমণে বের হন এবং প্রায় সাত বছর বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এই অভিজ্ঞতার ফল হিসেবেই তাঁর *সফরনামা* রচিত হয়। গ্রন্থটির বিশেষত্ব হলো–লেখক শোনা কথার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কেবল নিজের চোখে দেখা ঘটনাই লিপিবদ্ধ করেছেন। এই মনোভাব *সফরনামা*টিকে ঐতিহাসিকভাবে অধিক নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে।[৩৯] এটি তাঁর সাত বছরের দীর্ঘ ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ফসল।[৪০] *সফরনামা* রচনার পটভূমি হলো মূলত ভ্রমণকারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, জ্ঞানার্জন ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভূত, যেখানে তিনি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত ভ্রমণকালে দেখা স্থান, মানুষ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থার বিশদ বিবরণ লিখে রাখেন, যা পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক দলিল ও সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রাচীন নিদর্শনাবলী, ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ভৌগলিক তথ্যের জন্য এ গ্রন্থের বিকল্প নেই।[৪১] যেমন ইবনে বতুতার *রেহলা*। নাসের খসরুর *সফরনামা* রচনার পটভূমি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে এ গ্রন্থটি আকস্মিক বা নিছক ভ্রমণ-আগ্রহের ফল নয়; বরং এটি এক গভীর ব্যক্তিগত, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে জন্ম নেওয়া রচনা।

এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে এমন একসময়, যখন বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফত[৪২] ও মিশরের ফাতেমীয়[৪৩] খিলাফতের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের দুর্বলতা ও বিভিন্ন শহরের নৈতিক ও জ্ঞানগত অবক্ষয়ও সমালোচনার দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। এই রচনা প্রথাগত ইতিহাসবিদদের মতো সরকারি আনুগত্যে লেখা হয়নি; বরং একজন স্বাধীন চিন্তাবিদের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ফসল। এতে জনগণের জীবন ও সময়ের মনস্তত্ত্বও প্রতিফলিত হয়, যা একে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।[৪৪]একাদশ শতকের ইসলামি বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় বিভাজন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল, যেখানে চিন্তাশীল মানুষদের জন্য আত্মপরিচয় ও সত্যের অনুসন্ধান অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। নাসের খসরুর সফর এই বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই সংঘটিত হয় এবং *সফরনামা* সেই অভিজ্ঞতারই সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক রূপ।

নাসের খসরুর সফরের প্রধান প্রেরণা ছিল আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান। তাঁর নিজের বিবরণ অনুযায়ী, তিনি পার্থিব জীবন, প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং সামাজিক রীতিনীতিতে গভীর হতাশা অনুভব করছিলেন। এই হতাশা শুধু ব্যক্তিগত নয়; বরং সমকালীন সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যের প্রতিফলন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব, নৈতিক অবক্ষয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার অভাব তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই মানসিক সংকট থেকেই তাঁর দীর্ঘ সফরের সূচনা। এই সফরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল হজ পালন।[৪৫] হজ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি এবং মুসলমানদের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় কর্তব্য। তবে নাসের খসরুর ক্ষেত্রে হজ কেবল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি ছিল জ্ঞানের কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন ও বিভিন্ন ইসলামি সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণের একটি সুযোগ। হজযাত্রাকে কেন্দ্র করে তিনি পবিত্র মক্কা, মদীনা, জেরুযালেম, মিশর, ফিলিস্তিন এবং সুদানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণ করেন।[৪৬] যার ফলে তাঁর *সফরনামা* ভৌগোলিকভাবেও ব্যাপক তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

নাসের খসরুর সফরের একটি কেন্দ্রীয় দিক ছিল মিশরের ফাতেমীয় খেলাফতে দীর্ঘ অবস্থান। কায়রোতে তিনি যে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ প্রত্যক্ষ করেন, তা তাঁর চিন্তাধারায় মৌলিক পরিবর্তন আনে। ফাতেমীয় শাসনামলে কায়রো ছিল ইসলামি বিশ্বের অন্যতম প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র, যেখানে দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের চর্চা বিকশিত হয়েছিল। নাসের খসরু এই পরিবেশে ইসমাইলি মতাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন এবং এর যুক্তিবাদী ও সংগঠিত কাঠামোতে আকৃষ্ট হন।[৪৭] তিনি কেবল ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত অনুভূতি লিপিবদ্ধ করেননি; বরং প্রত্যেক নগরের প্রশাসনিক কাঠামো, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সফরের উদ্দেশ্যই যেন ছিল দেখা, যাচাই করা এবং তুলনা করা। এই তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি *সফরনামা*কে ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী করে তুলেছে। নাসের খসরু তাঁর ভ্রমণ শেষ করার বহু বছর পর এই গ্রন্থটি রচনা করেন বলে ধারণা করা হয়। ফলে এটি একটি পরিণত বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান থেকে লেখা স্মৃতিনির্ভর বিবরণ। স্মৃতিনির্ভর হওয়ায় এতে সময়ের ব্যবধানজনিত কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও, এই দূরত্ব লেখককে ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করার সুযোগ দিয়েছে। তিনি কেবল যা দেখেছেন তাই নয়; বরং কেন দেখেছেন এবং তার তাৎপর্য কী–সেটিও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। নাসের খসরু বিভিন্ন ভাষা, জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের জীবনযাপন, আচার-অনুশীলন ও সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। এই বহুসাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে বিস্তৃত করে এবং *সফরনামাকে* এক ধরনের আন্তঃসভ্যতাগত দলিলে পরিণত করে।

সফরনামার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

ইতিহাসচর্চায় *সফরনামা* একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উৎস হিসেবে স্বীকৃত। রাজকীয় ইতিহাস বা দরবারি দলিল যেখানে শাসককেন্দ্রিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, সেখানে *সফরনামা* সাধারণ সমাজ, নগরজীবন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রত্যক্ষ চিত্র উপস্থাপন করেছে। একাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফারসি কবি, দার্শনিক ও পর্যটক নাসের খসরুর *সফরনামা* এই দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যযুগীয় ইসলামের ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। তাঁর রচনায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক বাস্তবতার নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়।[৪৮]

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের দলিল

নাসের খসরুর *সফরনামা* মধ্যযুগীয় ইসলামি বিশ্বের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো অনুধাবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উৎস।[৪৯] রাজদরবারকেন্দ্রিক ইতিহাস বা বংশানুক্রমিক বিবরণের বাইরে গিয়ে এই গ্রন্থটি প্রশাসনের বাস্তব কার্যক্রম, শাসক ও প্রজার সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তথ্য প্রদান করে।[৫০] একজন সচেতন পর্যবেক্ষক হিসেবে নাসের খসরু বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনব্যবস্থাকে তুলনামূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন, যা ঐতিহাসিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। নাসের খসরুর *সফরনামায়* বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির উপস্থিতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সফরের সময় একদিকে আব্বাসীয় খিলাফত নামমাত্র ধর্মীয় কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল, অন্যদিকে সেলজুক তুর্কিরা কার্যকর রাজনৈতিক ক্ষমতা ধারণ করেছিল।[৫১] একই সঙ্গে মিশরের ফাতিমি খেলাফত আব্বাসীয়দের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছিল।[৫২] এই বহুধাবিভক্ত রাজনৈতিক বাস্তবতা *সফরনামার* বিবরণে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

সেলজুক-শাসিত অঞ্চলগুলোর প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতি নাসের খসরুর সমালোচনামূলক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি কর আদায়ের অনিয়ম, স্থানীয় শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং জনসাধারণের প্রতি অবিচারের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও এই সমালোচনার পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মতাদর্শিক অবস্থান কাজ করেছে, তবুও অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্রের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে সেলজুক আমলের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশাসনিক অস্থিরতা বাস্তবেই বিদ্যমান ছিল। এর বিপরীতে, ফাতিমি খেলাফতের ইতিহাসে তিনি কায়রো নগর ও ফাতিমি প্রশাসনের শৃঙ্খলা, শাসকের কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার বিশদ বিবরণ প্রদান করেছেন। তাঁর বর্ণনায় ফাতিমি শাসনব্যবস্থা একটি সুসংগঠিত ও কার্যকর রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে প্রতিভাত হয়। কায়রোর বাজার তদারকি ও ন্যায়বিচার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি ফাতিমি শাসনকে আদর্শ শাসনব্যবস্থা তথা আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বার্নার্ড লুইসের মতে, ফাতিমি মিসরের রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে নাসের খসরু একজন অন্যতম নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষ সাক্ষী।[৫৩] বিশেষত এই কারণে তাঁর *সফরনামা* রাজনৈতিক ইতিহাসচর্চায় একটি অপরিহার্য উৎস হিসেবে বিবেচিত।

অর্থনৈতিক ইতিহাসে সফরনামা

নাসের খসরুর *সফরনামা* মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। তিনি নগরের বাজারব্যবস্থা, দ্রব্যের প্রাচুর্য, মুদ্রা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কায়রোর বাজারে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতার কথা উল্লেখ করে তিনি ফাতিমি শাসনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রমাণ উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।[৫৪] এই বিবরণ মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও বাণিজ্যিক স্থিতিশীলতার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে *সফরনামার* গুরুত্ব আরও সুস্পষ্ট। নাসের খসরু বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্যের মূল্য, মুদ্রার মান এবং বাজার ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, মশলা ও মূল্যবান ধাতুর বাজারদরের যে তথ্য তিনি প্রদান করেছেন, তা সমকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। এই তথ্যগুলো ইতিহাসবিদদের জন্য মুদ্রাস্ফীতি, উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রবণতা বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরবরাহ করে আসছে সুদীর্ঘকাল ধরে।[৫৫] বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম *সফরনামার* একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাসের খসরু প্রধান বাণিজ্যপথ, বন্দরের কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ভারত, আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে মিশরের বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, একাদশ শতাব্দীতে ইসলামি বিশ্ব বৈশ্বিক বাণিজ্য নেটওয়ার্কের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছিল।[৫৬] এই বিবরণ অর্থনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি বিশ্বব্যবস্থার প্রাথমিক রূপ অনুধাবনে সহায়ক।

সমাজ ও নগর ইতিহাসে সফরনামা

নাসের খসরুর *সফরনামার* অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হলো সমাজ ও নগর ইতিহাসসংক্রান্ত তথ্য। তিনি নগরের রাস্তাঘাট, বাজার, আবাসনব্যবস্থা এবং জননিরাপত্তার বিবরণ দিয়েছেন। কায়রো সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন যে, মানুষ রাতেও নিরাপদে চলাচল করতে পারত।[৫৭] এই তথ্য মধ্যযুগীয় নগর প্রশাসনের দক্ষতা ও সামাজিক শৃঙ্খলার পরিচয় বহন করে। নগর ইতিহাসের ক্ষেত্রে নাসের খসরুর *সফরনামা* বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। তিনি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ নগরে প্রবেশের পর তার অবস্থান, আয়তন, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং নগর কাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন। ইসফাহান, নিশাপুর, দামেস্ক, জেরুজালেম বিশেষ করে কায়রোর বর্ণনা তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নগরের প্রাচীর, প্রবেশদ্বার, সড়কব্যবস্থা এবং আবাসিক এলাকার বিন্যাস সম্পর্কে তাঁর বিবরণ মধ্যযুগীয় নগর পরিকল্পনার একটি সুস্পষ্ট চিত্র প্রদান করে। কায়রো নগরের বিবরণ নাসের খসরুর *সফরনামার* অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি কায়রোকে শুধু ফাতেমীয় খেলাফতের রাজধানী হিসেবেই নয়; বরং একটি সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধ মহানগর হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। নগরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রশস্ত সড়ক, সুপরিকল্পিত বাজার এবং পানির সুব্যবস্থার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা মধ্যযুগীয় নগর সভ্যতার উচ্চমান নির্দেশ করে। বিশেষ করে পানীয় জল সরবরাহ ও খাদ্যবাজারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তাঁর চোখে ফাতেমীয় প্রশাসনের দক্ষতার প্রতীক। নাসের খসরু নগরের বাজারব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কায়রো শহরের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

> 'মিশরের রাজকোষ তখন এতই ঐশ্বর্য ছিল যে অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলিয়া দুই লক্ষ পনের হাজার রাজকীয় সৈন্য নিয়মিতভাবে বেতন পাইত। তাহাতেই সৈন্যদলের ভিতর কোনও প্রকার অসন্তোষের লক্ষণ কখনও দৃষ্ট হইত না। রাজশক্তি এ কারণে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু উভয় হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। রাজা ও প্রজাতে এমনই সদ্ভাব ছিল যে দেশে গোয়েন্দা পুলিশের প্রয়োজন হইত না। বাজারে ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ দোকানে তালাবদ্ধ করার আবশ্যকতা বোধ করিত না। নাগরিকগণের ঐশ্বর্যেরও কোনও সীমা ছিল না।'[৫৮]

তিনি বিভিন্ন নগরের বাজারে পণ্যের বৈচিত্র্য, মূল্য এবং নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রদান করেছেন। এই তথ্যগুলো অর্থনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি নগর জীবনের দৈনন্দিন বাস্তবতা অনুধাবনে সহায়ক। বাজারের অবস্থান, পেশাভিত্তিক দোকান বিন্যাস এবং ওজন ও মাপের মান নির্ধারণের বিষয়গুলো নগর প্রশাসনের ভূমিকা তুলে ধরে।

ধর্মীয় স্থাপনা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নাসের খসরুর নগর বিবরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মসজিদ, মাদ্রাসা, গ্রন্থাগার ও ধর্মীয় সমাবেশস্থলের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে নগরগুলো শুধু বাণিজ্যকেন্দ্রই নয়; বরং জ্ঞান ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবেও বিকশিত হয়েছিল। আল-আজহার মসজিদ সম্পর্কে তাঁর বিবরণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ফাতেমীয় যুগে একটি প্রধান জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। নাসের খসরু নগরগুলোর সামাজিক বিন্যাস সম্পর্কেও তথ্য প্রদান করেছেন। ধনী ও দরিদ্র অঞ্চলের পার্থক্য, আবাসিক এলাকার অবস্থান এবং জনসাধারণের চলাচলের ধরন থেকে নগরের সামাজিক স্তরবিন্যাস স্পষ্ট হয়। এই বিবরণ সমাজ ইতিহাস ও নগর সমাজতত্ত্বের জন্য মূল্যবান উপাদান সরবরাহ করে। হিউ কেনেডির মতে, 'ফাতেমি কায়রোর নগর কাঠামো ও সামাজিক জীবন বোঝার ক্ষেত্রে নাসের খসরুর *সফরনামা* একটি মৌলিক দলিল।'[৫৯]

ভৌগোলিক দলিল

মধ্যযুগীয় ইতিহাস পুনর্গঠনে ভৌগোলিক ও নগরসংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষেত্রে নাসের খসরুর *সফরনামা* একটি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত। একাদশ শতকের ইসলামি বিশ্বের বহু নগর, বাণিজ্যপথ ও জনবসতির যে বর্ণনা তিনি প্রদান করেছেন, তা কেবল সাহিত্যিক কল্পনার ফল নয়; বরং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরিমিত বিশ্লেষণের ভিত্তিও বটে। ফলে এই গ্রন্থটি ভৌগোলিক ইতিহাস ও নগর ইতিহাস–উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাসের খসরুর *সফরনামায়* ভৌগোলিক বিবরণের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো নির্দিষ্টতা। তিনি যে অঞ্চল দিয়ে ভ্রমণ করেছেন– খোরাসান, ইরান, আর্মেনিয়া, আনাতোলিয়া, সিরিয়া, আরব উপদ্বীপ ও মিশর– প্রতিটি অঞ্চলের পথ, দূরত্ব এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন। মরুভূমি, পাহাড়, নদী ও পানির উৎস সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা একাদশ শতাব্দীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক ভূগোল বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক।[৬০] তাঁর পর্যবেক্ষণ শুধু ভ্রমণকারীর অভিজ্ঞতা নয়; বরং সমকালীন যোগাযোগব্যবস্থা ও পরিবেশগত বাস্তবতার প্রতিফলন। তিনি শুধু স্থান বর্ণনাই করেননি, পাশাপাশি পথের নিরাপত্তা, সরাইখানা ও যাত্রীদের সুবিধার কথাও উল্লেখ করেছেন, যা ভৌগলিক ইতিহাসের পাশাপাশি সামাজিক বাস্তবতাও তুলে ধরে।[৬১] ইতিহাসবিদরা এই তথ্য ব্যবহার করে মধ্যযুগীয় বাণিজ্যপথ ও যাতায়াতব্যবস্থার মানচিত্র পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন।

ধর্মীয় ইতিহাসের দলিল

নাসের খসরুর *সফরনামা* একাদশ শতকের ইসলামি বিশ্বের ধর্মীয় বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উৎস। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মতাদর্শিক বিভাজন এবং ধর্মীয় অনুশীলনের যে বিবরণ তিনি প্রদান করেছেন, তা শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রতিফলন নয়; বরং সমকালীন সমাজের ধর্মীয় কাঠামোর একটি বাস্তব চিত্র।[৬২] ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিবরণগুলো মধ্যযুগীয় ইসলামি ধর্মীয় ইতিহাস পুনর্গঠনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। নাসের খসরুর *সফরনামায়* সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি এমন এক সময়ে ভ্রমণ করেছেন, যখন ইসলামি বিশ্ব গভীর মতাদর্শিক বিভাজনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল।[৬৩] আব্বাসীয় খেলাফত সুন্নি মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকাংশে সেলজুকদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। অন্যদিকে, ফাতেমীয় খেলাফত ইসমাইলি শিয়া মতাদর্শের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।[৬৪] এই দ্বৈত বাস্তবতা নাসের খসরুর বিবরণে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। ফাতেমীয় শাসনামলে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তচিন্তার যে পরিবেশ বিদ্যমান ছিল, নাসের খসরু তা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি কায়রোতে বিভিন্ন মতাদর্শের আলেম ও দার্শনিকদের মধ্যে মুক্ত বিতর্ক ও আলোচনার কথা বলেছেন। আল-আজহার মসজিদ ও অন্যান্য জ্ঞানকেন্দ্রে ধর্মীয় শিক্ষার যে কাঠামো তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তা মধ্যযুগীয় ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করে। ইসমাইলি মতাদর্শের সংগঠিত দাওয়াহ ব্যবস্থার বিবরণ *সফরনামার* একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নাসের খসরু ইসমাইলি দীক্ষা গ্রহণের পর দাওয়াহ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর, দাঈদের ভূমিকা এবং ধর্মীয় শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হন। তাঁর বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে ইসমাইলি মতাদর্শ শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস নয়; বরং একটি সুসংগঠিত বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক আন্দোলন ছিল।[৬৫] এই তথ্য ধর্মীয় ইতিহাস ও রাজনৈতিক ইতিহাস–উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। নাসের খসরু বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্মীয় অনুশীলন ও

আচার-অনুষ্ঠানের তুলনামূলক বিবরণ দিয়েছেন। নামাজ, রোজা, হজ এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার পালনের পদ্ধতিতে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এই বৈচিত্র্য একদিকে ইসলামি ঐক্যের ভেতর বহুত্বকে নির্দেশ করে, অন্যদিকে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবকেও তুলে ধরে।

ধর্মীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে *সফরনামার* আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পবিত্র স্থানগুলোর বিবরণ। মক্কা, মদিনা ও জেরুজালেম সম্পর্কে নাসের খসরুর পর্যবেক্ষণ শুধু ভক্তিপূর্ণ নয়; বরং ঐতিহাসিক ও স্থাপত্যগত তথ্যসমৃদ্ধ। তিনি কাবা, মসজিদে নববী ও বায়তুল মুকাদ্দাসের কাঠামো, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যা সমকালীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক।[৬৬] নাসের খসরুর *সফরনামা* ধর্মীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক অমূল্য দলিল। এটি একাদশ শতকের ইসলামি বিশ্বের ধর্মীয় বিভাজন, সহাবস্থান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের একটি সমৃদ্ধ চিত্র প্রদান করে। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, এই গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় ইসলামি ধর্মীয় ইতিহাস গবেষণায় অপরিহার্য উৎস হিসেবে বিবেচিত।

ইতিহাস রচনায় সফরনামার নির্ভরযোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতা

নাসের খসরুর *সফরনামা* ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উৎস হলেও এর ব্যবহার ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা এবং সীমাবদ্ধতা সমানভাবে বিবেচনা করতে হয়। *সফরনামা* মূলত ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং স্মৃতিনির্ভর বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে লেখা, যা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ উভয়ই প্রদান করে। প্রথমত, *সফরনামার* নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের প্রত্যক্ষতা প্রধান ভূমিকা রাখে। নাসের খসরু যেসব অঞ্চল, নগর ও প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন, সেই তথ্য সমকালীন প্রশাসনিক নথি বা অন্যান্য সাক্ষ্য সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ইতিহাস রচনায় ব্যবহার করা যায়। যেমন কায়রো, জেরুজালেম বা ইসফাহান শহরের ভৌগোলিক ও নগর কাঠামো সম্পর্কিত তথ্য বেশিরভাগই সমকালীন অন্যান্য উৎস দ্বারা সমর্থিত।[৬৭] দ্বিতীয়ত, *সফরনামায়* রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কিত তথ্যও উচ্চ গুরুত্ব বহন করে। সেলজুক ও ফাতেমীয় শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ইতিহাসবিদদের একাদশ শতকের রাজনৈতিক বাস্তবতা বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক। কর ব্যবস্থা, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসনিক সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কিত বিবরণ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য।[৬৮] তবে *সফরনামার* নির্ভরযোগ্যতায় সীমাবদ্ধতাও আছে। নাসের খসরুর ইসমাইলি মতাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ এবং ফাতেমীয় শাসনের প্রতি আনুগত্য তাঁর পর্যবেক্ষণে পক্ষপাত তৈরি করেছে।[৬৯] সুন্নি শাসন ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাব এই পক্ষপাতকে দৃঢ় করেছে। ফলে সমালোচনামূলক ইতিহাস রচনায় এই পক্ষপাতকে বিবেচনায় নেওয়া অপরিহার্য।

সীমাবদ্ধতার আরেকটি দিক হলো স্মৃতিনির্ভরতার প্রভাব। সফরের অনেক ঘটনা ও নগরবিবরণ তিনি সফর শেষ করার পর রচনা করেছেন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান কিছু তথ্যের বিশুদ্ধতা বা উপযুক্ততা প্রভাবিত করতে পারে। তবে এই স্মৃতিনির্ভরতার একটি সুবিধা হলো লেখক ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করার সুযোগ পেয়েছেন, যা শুধুমাত্র দিনের বিবরণে পাওয়া সম্ভব নয়। ভৌগোলিক ও নগর ইতিহাসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তুলনামূলকভাবে কম। স্থাপত্য, নদী, বাজার এবং শহর পরিকল্পনার তথ্য প্রায়শই প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে ভিত্তি করে, যা তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য। তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবরণ নির্ভর করে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নগরকেন্দ্রিক মনোভাবের উপর, ফলে গ্রামীণ জীবনের তথ্য তুলনামূলকভাবে সীমিত। সংক্ষেপে বলা যায়, নাসের খসরুর *সফরনামা* ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত মূল্যবান একটি উৎস। এর নির্ভরযোগ্যতা প্রধানত ভৌগোলিক, নগর ও প্রশাসনিক তথ্যের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট, কিন্তু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিকের তথ্যের ক্ষেত্রে পক্ষপাত ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রভাব রয়েছে। ইতিহাসবিদদের দায়িত্ব হলো এই পক্ষপাত ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে তথ্যকে সমকালীন অন্যান্য উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা।

সফরনামার সামগ্রিক ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

নাসের খসরুর *সফরনামা* একাদশ শতকের ইসলামি বিশ্বের ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি, প্রশাসন এবং ধর্মীয় বাস্তবতার এক অনন্য দলিল। একাধারে এটি ভ্রমণবৃত্তান্ত, পর্যবেক্ষণমূলক ইতিহাস এবং সাহিত্যিক সৃষ্টি। এর সার্বিক মূল্যায়ন করার সময় আমরা একাধিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

প্রথমত, ভৌগোলিক ও নগর ইতিহাসে *সফরনামার* অবদান অপরিসীম। খসরুর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী শহরের কাঠামো, রাস্তা, প্রাচীর, নদী, বাজার এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের বিবরণ একাদশ শতকের নগর সভ্যতার বাস্তব চিত্র প্রদান করে। ইতিহাসবিদরা এই তথ্য ব্যবহার করে মধ্যযুগীয় নগর পরিকল্পনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করেছেন।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তথ্যের ক্ষেত্রে *সফরনামা* একটি মূল্যবান উৎস। ফাতেমীয় ও সেলজুক শাসনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, কর ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো এবং শাসক-জনগণের সম্পর্ক–সবই একাদশ শতকের রাষ্ট্রব্যবস্থার স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। যদিও লেখকের পক্ষপাত কিছুটা প্রভাব ফেলেছে, তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তা নিরপেক্ষভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে।

তৃতীয়ত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও *সফরনামা*র গুরুত্ব বিশেষ। ধনী ও দরিদ্র, নগর ও গ্রামীণ, বিভিন্ন পেশাজীবীর জীবনযাপন এবং বাজার ও বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য সমকালীন সমাজ ও অর্থনীতির বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলে। বিশেষভাবে মধ্যযুগীয় ইসলামি বিশ্বের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কের বিষয়টি *সফরনামায়* সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

চতুর্থত, ধর্মীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে *সফরনামা* গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ফাতেমীয় শাসন ও ইসমাইলি দাওয়াহ ব্যবস্থার বর্ণনা, পবিত্র স্থানসমূহের পর্যবেক্ষণ, এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ মধ্যযুগীয় ইসলামি ধর্মীয় বাস্তবতা বোঝার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

পঞ্চমত, সাহিত্যিক মূল্য ও শৈলীর ক্ষেত্রে *সফরনামা* ইতিহাস এবং ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করেছে। সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা, জীবন্ত বর্ণনা, তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ এটিকে পাঠযোগ্য ও প্রামাণ্য উভয় দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, যেমন পক্ষপাত ও নগরকেন্দ্রিক মনোভাব, নাসের খসরুর *সফরনামা* মধ্যযুগীয় ইসলামি বিশ্বের পুনর্গঠনে এক অপরিহার্য উৎস। ইতিহাসবিদদের দায়িত্ব হলো পক্ষপাত ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে তথ্যসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, নাসের খসরুর সফর ও *সফরনামা* রচনার উদ্দেশ্য ছিল বহুমাত্রিক–আত্মিক অনুসন্ধান, জ্ঞানার্জন, ধর্মীয় কর্তব্য পালন এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার পর্যবেক্ষণ। এই বহুমাত্রিকতাই *সফরনামা*কে কেবল সাহিত্যিক গ্রন্থ নয়, বরং একাদশ শতাব্দির ইসলামি বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সফরের উদ্দেশ্য ও রচনার পটভূমি অনুধাবন করলে *সফরনামা*র ঐতিহাসিক মূল্যায়ন আরও সুসংহত ও কাহিনী অর্থবহ হয়ে ওঠবে। নাসের খসরুর *সফরনামা* কেবল ভ্রমণলিখন নয়; এটি একাধারে ইতিহাস, সাহিত্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং ধর্মীয় তথ্যের সমন্বয়। মধ্যযুগীয় ইসলামি বিশ্বের বাস্তব চিত্র, প্রশাসনিক দক্ষতা, সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং ধর্মীয় পরিবেশ বোঝার জন্য এটি এক অমূল্য দলিল। ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক এবং সমাজবিজ্ঞানীর জন্য এটি একইসঙ্গে তথ্যসূত্র এবং বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ হিসেবে সমান গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বিশ্বকোষের ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে নাসের খসরুর *সফরনামা* একটি যুগান্তকারী এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিদর্শন হিসেবে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] **আল-মুকাদ্দাসি:** আল-মুকাদ্দাসি (পূর্ণ নাম: শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল-মুকাদ্দাসি) ছিলেন দশম শতাব্দির একজন প্রখ্যাত আরব ভূগোলবিদ এবং পর্যটক। তিনি আনুমানিক ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০০০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উপাধি "আল-মুকাদ্দাসি" এসেছে 'আল কুদ্‌স' (জেরুজালেম) থেকে। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল-শাম, মিসর, ইরাক, আবব উপদ্বীপ, পারস্য প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। তাঁর ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ হলো *আহসান আত-তাকাসিম ফি মারিফাত আল-আকালিম*। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন প্রদেশের ভৌগলিক অবস্থান, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চর্চার বিস্তারিত বিবরণ দেন। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হলো-প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব, অঞ্চল ভিত্তিক সুসংগঠিত বর্ণনা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ। তাঁকে ইসলামি ভূগোলচর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। [দ্রষ্টব্য: *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খণ্ড-১ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৩৫৪-৩৫৬।]

[২] **ইবনে হাওকাল:** ইবনে হাওকাল (আবু আল-কাসিম মুহাম্মদ ইবনে হাওকাল) ছিলেন দশম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ও ভূগোলবিদ। তিনি মূলত বাগদাদ অঞ্চলের অধিবাসি ছিলেন। ৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল-ইরাক, পারস্য, আরব, সিরিয়া, মিশর, উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেন পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক* গ্রন্থে তিনি সমকালীন বিশ্বের ভৌগলিক অবস্থান, নগর-জনপদ, অর্থনীতি, বাণিজ্যপথ, কৃষি, খনিজ সম্পদ ও জনজীবনের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। তিনি পূর্ববর্তী ভূগোলবিদ আল-ইস্তাখরি-এর রচনাকে সংশোধন ও সম্প্রসারণ করেন এবং নিজস্ব পর্যবেক্ষণ সংযোজন করেন। ইবনে হাওকালের ভ্রমণবর্ণনা বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রচিত; ফলে তাঁর গ্রন্থ মধ্যযুগীয় ইসলামি ভূগোলচর্চায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত। [দ্রষ্টব্য: ইসলামি বিশ্বকোষ, খণ্ড-২ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৪৭৮-৪৮০।]

[৩] **ইবনে বতুতা:** ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৬৮ খ্রি.) ছিলেন মরক্কোর তাঞ্জিয়ার নগরের একজন প্রসিদ্ধ মুসলিম পর্যটক ও পর্যবেক্ষক। ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে হজ পালনের উদ্দেশ্যে তিনি ভ্রমণ শুরু করেন এবং প্রায় ত্রিশ বছর ধরে উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা, পারস্য, ভারত, মালদ্বিপ, শ্রীলংকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীন পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। ভারতে তিনি দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক-এর দরবারে কাজী হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত **রেহলা** (পূর্ণ নাম: *তুহফাতুন নুযযার ফি গারায়িবিল আমসার ওয়া আজায়িবিল আসফার*) মধ্যযুগীয় ইসলামি বিশ্ব ও সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত। ইবনে বতুতার রচনায় রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সামাজিক রীতি-নীতি, অর্থনীতি, ধর্মীয় অনুশীলন ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের জীবন্ত বিবরণ পাওয়া যায়, যা ইতিহাস গবেষণায় অমূল্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। [দ্রষ্টব্য: Ibn Battuta, *TheTravels of Ibn Battuta* H.A.R. Gibb Trans. (New Delhi: Low Price Publications,2002 AD), pp.179-195.]

[৪] ড. যাবিহুল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, ২য় খণ্ড (তেহরান: এন্তেশারাতে ফেরদৌস, ১৩শ সংস্করণ, ১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ৪৪৩।

[৫] *https://en.wikipedia.org/wiki/Nasir_Khusraw#Name;* আব্দুস সাত্তার, *ফার্সী সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১৯।

[৬] বদিউজ্জামান ফোরুযানফার, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরান: ওয়ারাতে ফারহাঙ্গ ও এরশাদে ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৩ হি.শা.), পৃ. ৩৩৫।
[৭] মির্যা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদাব নামায়ে ইরান* (লাহোর: আসেফ জাভীদ, তা.বি.), পৃ. ২৪১।
[৮] *https://parstoday.ir/bn/radio/programs-i57528-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E*
[৯] মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, *পারস্য প্রতিভা*, ১ম ও ২য় খণ্ড (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৭৫।
[১০] মেহেদী মোহাক্কিক, (সম্পা.), *শারহে সি কাসিদেহ* (তেহরান: এন্তেশারাতে তুস, ১৩৬৯ হি.শা.), পৃ. ৮।
[১১] Tanwir Ahmad, *A Short History of Persian Literature* **(**Calcutta: Naaz Publishing Centre, 2nd Edition 1991), p. 128; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৬১।
[১২] *https://www.wikiwand.com/bn/articles/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%*
[১৩] *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৩।
[১৪] *আদাব নামায়ে ইরান*, পৃ. ২৪১-২৪২।
[১৫] বদিউজ্জামান ফোরুযানফার, *সুখান ওয়া সুখান ওয়ারান* (তেহরান: এন্তেশারাতে গুলশান ৪র্থ প্রকাশ, ১৩৬৯ হি.শা.), পৃ. ১৫৫।
[১৬] *আদাব নামায়ে ইরান*, পৃ. ২৪২।
[১৭] মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৭৯।
[১৮] *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৫।
[১৯] মোঃ আবুল হাসেম, *নাসির খসরু : জীবন ও কর্ম*, *The Chittagong University Journal of Arts and Humanities*, Vol. XX, Part-1, 2004, p. 232।
[২০] *ফার্সী সাহিত্যের কালক্রম*, পৃ. ১৯।
[২১] মোঃ আবুল হাসেম, *নাসির খসরু : জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২৩৩-২৩৪।
[২২] *https://en.wikipedia.org/wiki/Nasir_Khusraw*
[২৩] *সুখান ওয়া সুখান ওয়ারান*, পৃ. ১৫৬।
[২৪] *পারস্য প্রতিভা*, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬।
[২৫] **ইসমাইলি:** শিয়া মাযহাবের অনুসারীদের একটি দল। তাঁরা হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বংশধারায় ইমামতের ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের আকিদা মতে, ষষ্ঠ শিয়া ইমাম জা'ফর আস-সাদিক (র.) এর পর তাঁর প্রথম সন্তান ইসমাঈল ইবনে জাফরকে সপ্তম ইমাম হবেন, ইমাম মুসা কাজিম নয়। এই মতবাদে বিশ্বাসী শিয়াদেরকে ইসমাইলি বলা হয়। [দ্রষ্টব্য: *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৪৯৮।]
[২৬] *সুখান ওয়া সুখান ওয়ারান*, পৃ. ১৫৬।
[২৭] *ইরানের কবি*, পৃ. ৮১।
[২৮] মোঃ আবুল হাসেম, *নাসির খসরু : জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২৩৭।
[২৯] *A Short History of Persian Literature,* p. 128.
[৩০] ফরহাদ দফতরী, *ইসমাইলি: তাদের ইতিহাস ও মতবাদ* (কেমব্রিজ: কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২০৭।
[৩১] ড. আহমদ তামীমদারী, তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনূ.) *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস* (আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১১২।
[৩২] *A Short History of Persian Literature,* p. 126.
[৩৩] *পারস্য প্রতিভা*, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১।
[৩৪] জাফর ইয়াহাকি, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, ১ম ও ২য় খণ্ড (তেহরান: ইরান শিক্ষামন্ত্রণালয়, শিরকত অফসেট, ১৩৭৭ হি.শা.), পৃ. ১০০।
[৩৫] **সিয়াসতনামা:** *সিয়াসতনামা* মধ্যযুগীয় ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এর রচয়িতা খাজা নিযামুল মুলক তুসি (১০১৮-১০৯২ খ্রি.), যিনি সেলজুক সাম্রাজ্যের একজন প্রখ্যাত প্রধানমন্ত্রী ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। গ্রন্থটি মূলত শাসকদের জন্য একটি নীতিনির্দেশনামূলক রচনা, যেখানে আদর্শ শাসনব্যবস্থা প্রশাসনিক কাঠামো, ন্যায়বিচার, রাজকর্মচারীদের দায়িত্ব ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ইতিহাস, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বাস্তব রাজনীতির অভিজ্ঞতার সমন্বয় লক্ষ করা যায়। নিযামুল মুলক কুরআন-হাদিস, প্রাচীন পারসিক রাজনীতি ও সমসাময়িক শাসনব্যবস্থার উদাহরণ তুলে ধরে একজন শাসকের নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও প্রজাদের প্রতি কর্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচার ও প্রশাসনিক অব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার ওপর জোর দিয়েছেন। সাহিত্যিক দিক থেকে *সিয়াসতনামা* সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হলেও এর বিষয়বস্তু গভীর ও চিন্তাশীল। এটি শুধু রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গ্রন্থ নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক দলিল, যা মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক দর্শন ও প্রশাসনিক বাস্তবতা বুঝতে সহায়ক। এ কারণে *সিয়াসতনামা* আজও ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তা ও প্রশাসনিক ইতিহাসে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। [দ্রষ্টব্য: নিযামুল মুলক, হুবার্ট ডার্কে সম্পা. *সিয়াসতনামা* (তেহরান: এন্তেশারাতে এলমি ওয়া ফারহাঙ্গি, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৪৫।]
[৩৬] **তারিখে বায়হাকী:** ফারসি সাহিত্যের একটি অমূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এর রচয়িতা আবুল ফজল মোহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকী (৯৯৫-১০৭৭ খ্রি.)। গ্রন্থটি মূলত গজনভী আমলের ইতিহাস, বিশেষ করে সুলতান মাহমুদ গজনভী ও সুলতান মাসউদ গজনভী-র শাসনকালকে কেন্দ্র করে রচিত। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব হলো-এটি কেবল রাজকীয় ঘটনাবলির বিবরণ নয়; বরং সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতি, প্রশাসন, দরবারি জীবন ও মানবচরিত্রের সুক্ষ্ম বিশ্লেষণের এক বাস্তবধর্মী দলিল। বায়হাকী নিজে গজনভী দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়ায় তাঁর বিবরণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাষা ও রীতির দিক থেকে তারিখে বায়হাকী ফারসি গদ্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। এতে অলঙ্কারবহুলতা পরিহার করে সরল, সংযত ও সত্যনিষ্ঠ গদ্যভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক বর্ণনার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষা, মানবিক উপলব্ধি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সংমিশ্রণ এ গ্রন্থকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। এই কারণে *তারিখে বায়হাকী* শুধু একটি ইতিহাস গ্রন্থ নয়; এটি ফারসি সাহিত্য, ইতিহাসচর্চা ও রাজনৈতিক চিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। [দ্রষ্টব্য: আবুল ফজল মোহাম্মদ ইবনে হুসাইন, আলী আকবর ফাইয়্যাজ সম্পা. *তারিখে বায়হাকী* (তেহরান: এন্তেশারাতে দানেশগাহে তেহরান, ১৯৪৯ খ্রি.), পৃ. ১২৩।]
[৩৭] *পারস্য প্রতিভা*, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭।
[৩৮] *ফার্সী সাহিত্যের কালক্রম*, পৃ. ২০।
[৩৯] Nasir Khusraw, *Safarnama,* ed. Iraj Afshar (Tehran: Intisharat-e Ilmi, 1983 AD), p. 12.
[৪০] *https://www.shampratikdeshkal.com/art-literature/168890*

[৪১] মোঃ আবুল হাসেম, *নাসির খসরু ঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২৩৯।

[৪২] **আব্বাসীয় খিলাফত:** আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) ছিল ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী ও দীর্ঘস্থায়ী শাসনব্যবস্থা। এটি উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাসীয়রা ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আবু আল আব্বাস আস সাফ্ফাহ প্রথম খলিফা হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আব্বাসীয় শাসনের রাজধানী প্রথমে কুফা হলেও পরবর্তীতে ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-মানসুর বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করে রাজধানী স্থানান্তর করেন। বাগদাদ অচিরেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। বিশেষত খলিফা হারুন আর রশিদ ও আল মামুন এর আমলে শিক্ষা ও অনুবাদ আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়; গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান আরবী ভাষায় অনূদিত হয় এবং 'বায়তুল হিকমা' (জ্ঞানালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক দিক থেকে আব্বাসীয়রা পারস্যীয় আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাদের শাসনামলে অর্থনীতি, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। যদিও পরবর্তীতে কায়রোতে প্রতীকী আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রকৃত ক্ষমতা আর ফিরে আসে না। নবম শতাব্দির পর প্রাদেশিক শাসকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও তুর্কি সামরিক প্রভাবের কারণে কেন্দ্রীয় শাসন দূর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোল নেতা হুলাগু খানের বাগদাদ আক্রমণের মাধ্যমে আব্বাসীয়দের রাজনৈতিক অবসান ঘটে। [দ্রষ্টব্য: Philip K. Hitti, *The History of Arabs* (London: Macmillan, 1970 AD), pp. 281-330.]

[৪৩] **ফাতেমীয় খিলাফত:** ফাতেমীয় খিলাফত (৯০৯-১১৭১ খি.) ছিল একটি ইসলামি শিয়া খিলাফত, যা মূলত ইসমাইলি মতবাদের অনুসারী ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী বিল্লাহ। প্রথমে উত্তর আফ্রিকার ইফ্রিকিয়ায় (বর্তমান তিউনিসিয়া অঞ্চল) এই খিলাফতের সূচনা হয়। পরবর্তীতে ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি জওহর আল-সিকিল্লি মিশর বিজয় করেন এবং কায়রো নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ফাতেমীয়রা নিজেদেরকে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বংশধর বলে দাবী করতেন; এই কারণেই তাদের নাম "ফাতেমীয়"। ৯৭০ খিস্টাব্দে তারা আল-আজহার মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীকালে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফাতেমীয় খিলাফতের শাসনামলে মিশরে প্রশাসনিক দক্ষতা, বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং শিল্প-সংস্কৃতির উন্নতি সাধন হন। তাদের শাসনকালে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ হয়। তবে অভ্যন্তরীণ দূর্বলতা, অর্থনৈতিক সংকট ও ক্রুসেডার আক্রমণের ফলে তাদের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। অবশেসে ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে সালাহউদ্দিন আইউবি ফাতেমীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে আইউবীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং, ফাতেমীয় খিলাফত ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, বিশেষত শিয়া ইসমাইলি মতবাদের বিস্তার ও কায়রোকে কেন্দ্র করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য। [দ্রষ্টব্য: ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, *ইসলামের ইতিহাস (মধ্যযুগ)* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২৩১-২৩৮।]

[৪৪] *https://www.shampratikdeshkal.com/art-literature/169591*

[৪৫] মো. শফিউল্লাহ, কবি নাসের খসরুর কাব্য: পরিচিতি ও বিষয়বৈচিত্র, *গবেষণা পত্রিকা* (কলা অনুষদ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭তম সংখ্যা, ২০১১-২০১২, পৃ. ৭০।

[৪৬] *তদেব*।

[৪৭] *পারস্য প্রতিভা*, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬।

[৪৮] Evans, R.J.W., *In Defence of History* (London: Granta Books, 1997), p. 45.

[৪৯] *Safarnama*, pp. 1-5.

[৫০] Robinson Chase F., *Islamic Historiography* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 92.

[৫১] Bosworth, C.E., *The New Islamic Dynasties* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996), pp. 38-40.

[৫২] Halm, Heinz, *The Fatimids and Their Traditions of Learning* (London: I.B. Tauris, 1997), pp. 21-23.

[৫৩] Lewis, Bernard, *The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years* (New York: Scribner, 1995), p. 89.

[৫৪] Nasir Khusraw, *Safarnama*, trans. Wheeler M. Thackston (Albany: SUNY Press, 1986), pp. 101-102.

[৫৫] Pamuk, Şevket, *A Monetary History of the Ottoman Empire* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), pp. 12-14.

[৫৬] Abu-Lughod, Janet L., *Before European Hegemony: The World System A.D. 1250–1350* (Oxford: Oxford University Press, 1989), pp. 34-36.

[৫৭] *Safarnama*, pp. 98.

[৫৮] *পারস্য প্রতিভা*, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১।

[৫৯] Hugh Kennedy, *Cairo: 1000 Years of the City Victorious* (London: Duckworth, 1998), pp. 53-55.

[৬০] Nasir Khusraw, *Safarnama*, ed. Mojtaba Minovi (Tehran: Amir Kabir, 1983), pp. 18-20.

[৬১] C.E. Bosworth. Islamic Geographical Literature, Encyclopaedia of Islam, Vol. II (Leiden: Brill, 1991), p. 575.

[৬২] Robinson, Chase F., *Islamic Historiography* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 101.

[৬৩] Hodgson, Marshall G.S., *The Venture of Islam*, Vol. 2 (Chicago: University of Chicago Press, 1974), pp. 35-38.

[৬৪] Halm, Heinz, *The Fatimids and Their Traditions of Learning* (London: I.B. Tauris, 1997), pp. 19-22.

[৬৫] Daftary, Farhad, *The Ismāʿīlīs: Their History and Doctrines* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 150.

[৬৬] *Safarnama*, pp. 118-122.

[৬৭] Le Strange, Guy, *Palestine Under the Moslems* (London: Routledge, 1890), pp. 210-215.

[৬৮] Halm, Heinz, *The Fatimids and Their Traditions of Learning* (London: I.B. Tauris, 1997), p. 33.

[৬৯] Daftary, Farhad, *The Ismāʿīlīs: Their History and Doctrines* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 142-145.